আকাশ

তাহমিদ হাসান মুত্তাকী

[বইটি পুনরায় অনলাইনে আপলোড করা থেকে বিরত থাকার জন্য
বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো]

আকাশ

তাহমিদ হাসান মুত্তাকী

পিডিএফ সংস্করণ

প্রকাশকাল: জুন ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা

এক

পাহাড়ঘেরা এই জনপদ। একদিকে নদী বয়ে গেছে। শহরের সাথে যোগাযোগ শুধু সরু এক পাহাড়ি পথে। নদীপথে যদি যেতে চাও, তবে অপেক্ষা করতে হবে বড় ট্রলারগুলোর জন্য, যেগুলো বছরে কয়েকবার শুধু ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসে। অথচ এরই মাঝে জীবন তার পথ করে নিয়েছে নিজের মত করে। যেন পাথরের মাঝে বেড়ে ওঠা সবুজ এক চারাগাছ চিৎকার করে বলছে, আমি বেঁচে আছি।

লোককথা কিংবা কিংবদন্তী হয়ে গল্পগুলো এখানে চলে এসেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। এমন এক সভ্যতার গল্প যাদের নিঃসঙ্গতা হার মানায় আর সব নীরবতাকে। অনিকের মনে পড়ে শীতের সন্ধ্যায় দাদী যখন সে গল্পগুলো বলতেন। বিদ্যুৎ তখনো এই এলাকাতে আসেনি। মোমবাতির নিভু নিভু আলোতে তন্ময় হয়ে শুনতো ওরা, "যখন রাইতে ঘোর বৃষ্টি নামে, ওই সময়ে পাহাড়ের দিকে দেখবি নীল আলো জ্বলতেসে। তবে ওইদিকে খবরদার যাইস না। একবার গেলে আর ফিরতে পারবি না।"

অনিকের ছোট বোন মায়া প্রশ্ন করতো, "দাদী, এটা গল্প নাকি সত্যিই?"
"ধুর বোকা! সত্যি কেন হবে, গল্প এগুলো," অনিক বলত।
দাদী কিছু বলতেন না, শুধু হাসতেন।

জীবন সহজ ছিলো তখন। শীতকালে স্কুল যখন বন্ধ থাকতো, তখন জীবন সবচেয়ে সুন্দর মনে হত। সারাদিন কী করছ খোঁজ রাখার কেউ ছিলো না। অনিক ওর বন্ধু রাফি আর রাহাতদের সাথে পাহাড়ের মাঝে অদ্ভুত কিছু বা নতুন কোন গুহা খুঁজে বেড়াতো। কখনো কখনো মায়া কিংবা ছোটরাও থাকতো সাথে, তাদের আগ্রহ ছিলো লোককথার সেই হারিয়ে যাওয়া জগতের দরজা খুঁজে বের করা। দিনগুলো সুন্দর চলছিলো।
তারপর একদিন, মায়া হারিয়ে গেলো!

দুই

পাহাড়ের ওপরে নীলাভ আলো। মায়া হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেখান থেকে। অনিক সেদিকে আগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশ পাহাড়টা যেন দূরে সরে যেতে থাকে। ঘুম ভেঙে যায় ঠিক তখন। একটা চাপা আর্তনাদ অনিকের হৃদয়কে ঘিরে ধরে। দূর থেকে ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসে। মনে পড়ে ফেলে আসা সে গ্রামের কথা, যেখানে ছোটবেলায় গল্প শোনানো সেই দাদী ঘুমিয়ে আছে চিরনিদ্রায়। মা-বাবা যেখানে আছে। হারিয়ে যাওয়া ছোট বোনটার স্মৃতি যার প্রতিটা কোণায় মিশে আছে।

মায়া হারিয়ে যাওয়ার পর অনিকের মনে হয়েছিলো জীবন বোধহয় থেমে যাবে। কিন্তু জীবন কীভাবে যেন ঠিকই তার পথ খুঁজে নেয়। গ্রামের একমাত্র স্কুলটা প্রাইমারিতেই শেষ। রেজাল্ট ভালো ছিলো। স্যাররা তার বাবাকে বলেছিলেন শহরে পাঠাতে, পড়াশোনা করিয়ে যেতে। গ্রাম ছেড়ে বড় শহরের দিকে যাওয়া- অনিকের চোখেমুখে তখন ছিলো স্বপ্ন আর আনন্দ। কিন্তু মা-বাবার চোখে বিষাদ ছাড়া কিছু ছিলো না। তখন তার মানে বুঝেনি অনিক। চার বছর পর, এখন প্রতি মুহূর্তে সে বিষাদমাখা যন্ত্রণা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়।

কখনো অনিকের মনে হয় একদিন গ্রামের দিকে যাওয়া ট্রেনটা ধরে রওনা দিবে। ওখান থেকে ভ্যানগাড়িগুলো পৌঁছে দিবে পাহাড়গুলোর কাছে। তারপর আবার হাঁটবে চিরচেনা সেই পাথরগুলোতে ঘেরা পাহাড়ি পথে গ্রামের দিকে।

কিন্তু...

কিন্তু কী যেন তাকে বাঁধা দেয়। অনিকদের গ্রামে টেলিফোন পৌঁছায়নি। মা-বাবার সাথে কথা শুধু চিঠিতে হয়েছে। রাফি, রাহাত আর স্কুলের সব বন্ধুরা- ওরা গ্রামে থেকে গেছে। অনিক শহরে। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস হয় না।

দরজায় কড়া নাড়ে কেউ।

“অনিক! রুমে আছিস?” আবিরের গলা। অনিকের ক্লাসমেট।

“দরজা খোলা, ভেতরে আয়।”

দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে আসে আবির। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে বসে পড়ে বিছানায়।

“এখনই উঠলি ঘুম থেকে?”

“এইতো।... নাস্তা করেছিস?”

“না, এজন্যই ডাকতে আসলাম। চল।"

... ...

“চুপচাপ যে?” খিচুড়ির গ্রাস মুখে তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে আবির।

“না, কিছু না। বাসার কথা মনে পড়ছে।"

আবির কিছু বলে না। ওরও হয়ত মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি। ব্যস্ত শহরের কোলাহল যে স্মৃতিগুলো কেড়ে নিতে পারে না।

অনিক নীরবতা ভাঙে, “ম্যাগাজিনের জন্য কোন লেখা দিচ্ছিস এবার?”

“একটা গল্প দিয়েছি।”

“দেখালি না?”

“আগে দেখালে তো হলো না, ম্যাগাজিন বের হলে পড়িস। তুই দিচ্ছিস কিছু?”

“নাহ! লিখতে গেলে পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। ভাবনাগুলো আর শব্দ হয়ে ওঠে না।"

“খেয়েছে! সাহিত্যিক মানুষজন। তোদের গ্রাম থেকে ঘুরে আয় না একবার?”

“হ্যা। চিন্তা করছি। যাবো। যেতে হবে।"

যেতে হবে, মনে মনে বারবার প্রতিধ্বনি করতে থাকে অনিক।

তিন

সারি সারি ফসলের ক্ষেতগুলো ভেদ করে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। দু'পাশের গাছগুলো দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত গতিতে। শুধু রাতের আকাশটা আছে তার জায়গায়। চাঁদ নেই আজ আকাশে। তবু তারাগুলো ঠিকই তার মিটিমিটি আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন এভাবে আকাশ দেখেনি অনিক। শহরের বিদ্যুৎ বাতির ভিড়ে তারাদের মৃদু আলোগুলো হার মানে। কিন্তু আজ বহুদিন পর ঊষা, অনিরুদ্ধ আর চিত্রলেখ আবারও সফরসঙ্গী হয়েছে অনিকের। হাজার হাজার বছর ধরে যেভাবে মানুষকে সঙ্গ দিয়ে এসেছে ওরা। ওই তারাদের মাঝে কীভাবে যেন মানুষ খুঁজে পেয়েছে লুকিয়ে থাকা এক শিকারীকে। কিন্তু তারাদের মাঝে অনিক খুঁজে ফিরে মায়াকে। রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মায়ার চোখগুলো ওই তারাদের মতই জ্বলজ্বল করত।

রাতের ট্রেনের ভেতরেও রাত নামছে। অনিকের পাশের যাত্রীও ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে। অনিকও একসময় হারিয়ে যায় ঘুমের অন্তরালে।

চার

যদি তুমি অরিত্রি গাছের পাতাগুলো বেটে নেও, বেশ সুন্দর সবুজ রং পেয়ে যাবে। আর ফুলগুলো তোমাকে দিবে লাল রং। হলুদ রং বানানোটা একটু কঠিন। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সে সময়ের জন্য যখন কাঞ্চন ফুলগুলো ঝরে যায়। সদ্য ঝরে যাওয়া ফুলগুলো যদি তিনদিন ভিজিয়ে রাখো, তাহলে ওটা রং ছাড়তে শুরু করবে। যদি এই তিনটে রং তোমার কাছে থাকে, তবে তুমি যে রং খুশি সে রং বানাতে পারবে ওগুলো মিশিয়ে। কালো মাটির স্লেটে আঁকতে আরেকটা রঙ লাগবে তোমার, সাদা। ওটা সহজ, সাদা পাথরগুলো দিয়ে বেশ চলে যায়।

নীরা একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছে। তারাময় আকাশের ছবি। আর তার নিচে বিস্তৃত মাঠ। নীরা কখনো আকাশ দেখেনি। শুধু শুনেছে ওপরের পৃথিবীর আকাশটা নাকি রাতে তারায় ছেয়ে যায়।

"এরকম?" জিজ্ঞেস করে নীরা।
হাততালি দিয়ে ওঠে মায়া। "ঠিক এরকম!"
"ওপরের পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, না?"
"হ্যা," উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মায়ার চেহারা, "দিনের আলো, রাতের তারা..." থেমে যায় মায়া। নীরার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। আপন মনে আরেকবার পুনরাবৃত্তি করে সে, "ওপরের পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, তাই না?"

পাঁচ

অধ্যাপক আজমত ব্যস্তভাবে রুমের এ মাথা থেকে ও মাথা পায়চারি করে চলেছেন। কম্পিউটার স্ক্রিনের গ্রাফগুলো তাকে অস্থির করে রেখেছে। শুরু হয়েছিলো গতকাল স্যাটেলাইটের পাঠানো ডেটায় গ্রাভিটিতে সামান্য পরিবর্তন থেকে। অত্যাধুনিক যন্ত্র ছাড়া ধরাও যেত না। কিন্তু তার কারণ যত খুঁজতে গেছেন, সমস্যা তত জটিল হয়েছে।

"স্যার, চা দিব?" ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট রহমত জিজ্ঞেস করে।
"চা?... হ্যাঁ, দেও। চিনি বেশি।"

'আজমইতে আইজ আবার চিনি খাইতে চায় ক্যা,' মনে মনে ভাবে রহমত।
মুখে বলে, "জ্বী স্যার, দিচ্ছি।"

আরেকবার গ্রাফগুলোতে চোখ বুলানোর চেষ্টা করেন অধ্যাপক আজমত। 'কী হতে পারে এর অর্থ?'- নিজেকে প্রশ্ন করেন। 'গ্রাভিটির পরিবর্তন, পৃথিবীর অরবিটে কোন অ্যাস্টেরয়েড আসা বা অন্য কারণে হওয়া সম্ভব।' কিন্তু অধ্যাপক জানেন সেটা তার প্রশ্নের উত্তর না। 'কিন্তু তেমন কোন কিছু রাডারগুলোতে ধরা পড়েনি। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের গ্রাফও তার সাথে মিলছে না। চেঞ্জটা আরো ফান্ডামেন্টাল কিছু।'

"স্যার, চা।" রহমত চা রেখে যায় টেবিলে।

অনেকক্ষণ পরেও রহমত দেখে চা সেভাবেই পড়ে আছে, অধ্যাপকের ভাবনার নিমগ্নতা তখনো কাটেনি।

ছয়

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। রেলস্টেশনে নেমে অনিকের কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব মনে হয়। আশেপাশে কুলিদের হাঁকডাক, গাড়ির শব্দ। কিন্তু সবকিছুর ভিড়ে অনিকের অসম্ভব একা মনে হয় নিজেকে। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু আর পরিচিত মুখগুলো আরেকবার দেখার জন্য একদিকে মন তোলপাড় করে ওঠে, আর অন্যদিকে কী এক সংকোচ এসে তাকে ঘিরে ধরে। দূরের পাহাড়গুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। একটা ভ্যানগাড়ি ধরে অনিক।

অনিকের মনে হয়েছিলো পাহাড়গুলো তার চিরচেনা- প্রতিটা পাথর তার আপন। কিন্তু আজ মনে হয় সেই পথ যেন অভিমানী হয়ে আছে তার ওপর। দুয়েকবার শঙ্কা হয় ভুল পথে যাচ্ছে কিনা। তবে শেষাবধি ঠিকই পৌঁছে যায় নিজ গন্তব্যে। কী মনে করে পাহাড়ের একটু ওপরটায় উঠে গ্রামটাকে এক নজরে দেখে। মনে হয় যেন ঠিক আগের মতই, অথচ

যেন কত ভিন্ন। কিছু দালান উঠতে শুরু করেছে। বিদ্যুতের খুঁটি চোখে পড়ে কিছু। গ্রামেও যেন শহরের ছোঁয়া লাগছে।

গ্রামে ঢুকে প্রথমেই দেখা হয় মনা পাগলার সাথে। ছোটবেলায় অনিক কিছুটা ভয় পেতো তাকে। আজ অবশ্য অনিকের মনে অদ্ভুত উচ্ছ্বাস জেগে উঠে তাকে দেখে।

“ভালো আছেন মনা ভাই?”
“আমার নাম তো মনা না।"

পাগলাটে হাসির মাঝেও অনিক কী যেন একটা খুঁজে পায় মনা পাগলার উত্তরে। অবাক হয় অনিক। পাগলা ডাক আর অপমান যার নিত্যসঙ্গী, মনা নাম নিয়ে আপত্তি কেন তার? বাপ-মা কি তাকে অন্য কোন নাম দিয়েছিলো, আজ যে নাম সে খুঁজে বেড়ায়? অদ্ভুত হাসির আড়ালে চাপা কোন যন্ত্রণা কি তাকেও তাড়িয়ে বেড়ায়?

“তাহলে কী নাম আপনার?” অনিক জিজ্ঞেস করে।

মনা পাগলা হাসে। জবাব দেয় না। অনিক বুঝে উঠে না কী করবে। শেষে সন্তর্পনে সরে এসে আবারো পথ ধরে। পেছনে তাকিয়ে দেখে একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে মাটিতে আপন মনে দাগ কাটছে মনা পাগলা।

সাত

রাহাতরা চার ভাইবোন। রাহাত সবার ছোট। দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। বড় ভাই বাজারে একটা মুদি দোকান চালায়। স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পর আপাতত বাবার কৃষিকাজে সাহায্য করা, আর মাঝে মাঝে ভাইয়ের দোকানে বসা- এর বাইরে তেমন কিছু করছে না সে।